সংসদ 'নির্বাচন' ও ফলাফল সম্পর্কে

(জানুয়ারি ২য় সপ্তাহ, ২০১৯)

ভারতের দালাল হাসিনা-আওয়ামী লীগের ফ্যাসিবাদকে সশস্ত্র আঘাত করুন কৃষক-শ্রমিক-সাধারণ জনগণের গণক্ষমতা প্রতিষ্ঠার জন্য সংগ্রাম করুন

১। এটা কোনো নির্বাচনই হয়নি। শেখ হাসিনার সরকার ও আওয়ামী লীগ এ ধরনের একটি একতরফা ও ভোট-ডাকাতির নির্বাচনের প্রস্তুতি বিগত কয়েক বছর ধরেই চালিয়েছে। বিশেষত, গত সেপ্টেম্বর মাস থেকেই তারা তাদের প্রধান বিরোধী পক্ষকে মঞ্চ থেকে উচ্ছেদের সর্ববিধ শয়তানি ও ফ্যাসিস্ট কৌশল প্রয়োগ করেছে। এসবের মধ্য দিয়ে শাসকশ্রেণির নিজেদের বিভিন্ন গোষ্ঠীর মধ্যকার গণতন্ত্র, তথা ক্ষমতা হস্তান্তরের প্রধানতম উপায় বুর্জোয়া নির্বাচনকেও হাসিনা-আওয়ামী লীগ ধ্বংস করে দিয়েছে। আর সেটা করতে গিয়ে তারা রাষ্ট্রের সকল যন্ত্রগুলোকে (পুলিশ, মিলিটারি, আমলাতন্ত্র, আইন-আদালত– ইত্যাদি) নিজ দলীয় প্রতিষ্ঠানে পরিণত করেছে। মিডিয়াগুলোকেও মোসাহেব ও সুবিধাভোগীদের দ্বারা এবং পাশাপাশি 'ডিজিটাল আইনে'র ভয় দেখিয়ে আগেই তারা করায়ত্ত করে নিয়েছিল। ফলে এ 'নির্বাচন'টি হয়েছে ২০১৪ সালেরই ধারাবাহিকতা মাত্র। এ অবস্থায় ভোটের মাধ্যমে কৃষক-শ্রমিক-সাধারণ জনগণের ক্ষমতার কথা বলা বাতুলতা মাত্র।

– বুর্জোয়া গণতন্ত্র, ভোট আর আপস-সমঝোতার যতকিছু মূলা শাসকশ্রেণির বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ও ব্যক্তি– বুর্জোয়া দল, মিডিয়া, বুদ্ধিজীবী, এনজিও এবং তাদের বিদেশি প্রভুরা– দেখিয়েছিল, সবকিছুকে ধুলিসাৎ করে দিয়ে ভারতের মদদপুষ্ট হাসিনা-আওয়ামী লীগ নজিরবিহীন রাষ্ট্রীয় ও দলীয় সন্ত্রাস, ভোট-ডাকাতি, প্রহসন, প্রতারণা ও দলবাজির মাধ্যমে তাদের কুক্ষিগত ক্ষমতাকে আরেকবার আইনসঙ্গত করে নিয়েছে। ভারত প্রথম সুযোগেই তার সর্বপ্রধান দালাল হাসিনা-আওয়ামী ক্ষমতাকে পুনরায় বৈধতা দিয়েছে, চীনও বাদ যায়নি। আর অন্যসব পশ্চিমা সাম্রাজ্যবাদীরা মৃদু ভর্ৎসনা করলেও সংসদকে মানার মধ্য দিয়ে এবং 'নতুন' 'সরকারের সাথে কাজ করা'র কথা বলে এই নির্বাচনের প্রহসন ও হাসিনা-ফ্যাসিবাদকে মেনে নিতেই নসিহত করেছে। যার প্রতিফলন দেখা যায় ড.কামাল ও গণফোরামের প্রথম ঘোষণা, সংসদে যোগদানের ইচ্ছা প্রকাশের মাধ্যমে। যদিও একেবারে কোনঠাসা বিএনপি'র সামনে আর কোনো সম্মানজনক উপায় না থাকায় তারা সংসদ বর্জন করার সিদ্ধান্ত জানাচ্ছে।

এরশাদের জাতীয় পার্টি গতবার হাসিনার ইচ্ছায় সরকার ও বিরোধী দল উভয় জায়গায় অবস্থান নিয়ে এক নতুন প্রহসন ও হাস্যরসের জন্ম দিয়েছিল। আর এবার হাসিনারই ইচ্ছায়, জোটবদ্ধ নির্বাচন করা সত্ত্বেও, জাতীয় পার্টির সকল প্রধান নেতার ইচ্ছার বিরুদ্ধে গিয়ে তাদেরকে বিরোধী দলে থাকতে হচ্ছে। কারণ, বিএনপি'র বর্জনের কারণে সংসদ কার্যত সত্যিকার কোনো বিরোধী দল বিহীন হয়ে গেছে, যা বুর্জোয়া গণতন্ত্রকে ব্যঙ্গ করছে এবং শেখ হাসিনার মতো নির্লজ্জ-ফ্যাসিস্ট নেত্রীকেও লজ্জায় ফেলেছে। আবার প্রমাণ হয়েছে, জাতীয় পার্টি কোথায় বসবে সেটা কোনো বিষয় নয়; আসলে এই পার্টিটি হলো হাসিনা-আওয়ামী লীগের ফ্যাসিবাদী ক্ষমতাকে বৈধ করার জন্য তাদেরই বি-টিম মাত্র।

এসবই প্রমাণ করছে যে, হাসিনা-আওয়ামী লীগ, বিশেষত ভারতের মদদে যে ফ্যাসিবাদ চাপিয়ে দিয়েছে, তাকেই তারা শেষ পর্যন্ত অব্যাহত রাখতে চায়। যতদিন না সাম্রাজ্যবাদী ও ভারতীয় সম্প্রসারণবাদীদের অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্বের তীব্রতা বৃদ্ধির কারণে, এবং/অথবা রাষ্ট্রক্ষমতার দেশীয় প্রধান শক্তি সামরিক আমলাতন্ত্র এর বলপূর্বক উচ্ছেদ করছে, বা তাকে একটি 'বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক নির্বাচন' দিতে বাধ্য করছে, ততদিন এর কোনো পরিবর্তন এই ব্যবস্থায় আশা করা যায় না।

২। বিএনপি-২০ দলীয় জোট ও ঐক্যফ্রন্ট– এরা 'ভোট-বিপ্লব' ঘটানো, ভোটের মাধ্যমে হাসিনার ফ্যাসিবাদ অবসান এবং 'গণতন্ত্র' প্রতিষ্ঠার যে আওয়াজ দিয়েছিল সেটা সম্পূর্ণভাবে মাঠে মারা গেছে। ফ্যাসিবাদের অধীনে এটাই স্বাভাবিক। রাষ্ট্রক্ষমতার বাইরে থেকে বর্তমানে কোনো বুর্জোয়া দলের পক্ষেই এমন নির্বাচনে জিতে আসা সম্ভব নয়। সাম্রাজ্যবাদ, সুশীল সমাজ ও আমলাতন্ত্রের কিছু অংশ যে বুর্জোয়া গণতন্ত্রের মূলা জনগণের সামনে ঝুলিয়ে থাকে তা-যে সম্পূর্ণ ব্যর্থ সেটাও প্রমাণ হয়েছে।

প্রমাণ হয়েছে যে, বুর্জোয়া গণতন্ত্রের ফেরিওয়ালারা 'শান্তিপূর্ণ' পথে এই ফ্যাসিবাদের কবল থেকে দেশ ও জনগণকে মুক্ত করতে সক্ষম নয়।

৩। হাসিনা-আওয়ামী লীগের ফ্যাসিবাদ এভাবে বুর্জোয়া গণতন্ত্রকে ব্যর্থ করে দিয়ে বিপ্লবী আন্দোলনের পথকেই খুলে দিয়েছে। ভারতের মদদে এই হাসিনা-ফ্যাসিবাদ দীর্ঘস্থায়ীভাবে টিকে যাবার কারণে এবং বুর্জোয়া বিরোধী শক্তির একেবারে কোনঠাসা অবস্থার পরিস্থিতিতে ব্যাপক জনগণকে ঐক্যবদ্ধ করার, এবং বিপ্লবী ব্যানারে তাদেরকে টেনে আনার সুযোগ বৃদ্ধি হয়েছে।

বুর্জোয়া গণতন্ত্র, ভোট, সুশীল সমাজ, বুর্জোয়া পার্টি, ভারতীয় সম্প্রসারণবাদ, সাম্রাজ্যবাদ ইত্যাদির উপর জনগণের ক্ষোভ ও আস্থাহীনতাকে

বিপ্লবী কর্মসূচি ও পথে সংগঠিত করায় এ অবস্থা শর্ত সৃষ্টি করছে। এমনকি শাসকশ্রেণির মধ্যকার অন্তর্দ্বন্দ্বকে ব্যবহারের সুযোগও বৃদ্ধি করছে।

৪। পাশাপাশি ভারতের মদদ-প্রাপ্ত এই ফ্যাসিবাদ ভারত-বিরোধী ইসলামবাদী শক্তি এবং সশস্ত্র মৌলবাদী শক্তি বিকাশেরও শর্ত সৃষ্টি করেছে। আমলা-মুৎসুদ্দি বুর্জোয়া শাসকশ্রেণির নেতৃত্বাধীন চলমান ব্যবস্থা বিভিন্ন ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান, যথা– মাদ্রাসা, পীর, মাজার, তবলিগ, তালিম, সাধারণ শিক্ষার ধর্মীয়করণ, ওয়াজ, মসজিদ নির্মাণ, জাতীয় পত্রিকায় ধর্মীয় পৃষ্ঠা, টিভি-রেডিওতে ধর্মীয় অনুষ্ঠান এবং ধর্মবাদী রাজনৈতিক দল পোষণের মাধ্যমে ধর্মবাদের ভিত্তি তৈরি করেই রেখেছে। এর উপর হাসিনা সরকারের মদদে বিগত ১০ বছরে দেশে ধর্মবাদী শক্তির বিরাট বিকাশ ঘটেছে। মাদ্রাসার সংখ্যা দ্বিগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। 'তালিম' নামের নারী-মৌলবাদী তৎপরতা খুবই শক্তিশালী হয়েছে। সরকারি মদদে পীর-মাজার-ওয়াজ-মসজিদ-ধর্মীয় দলগুলোর বাড়-বাড়ন্ত অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে। ভোটবাজীর স্বার্থে চরম প্রতিক্রিয়াশীল ধর্মীয় মৌলবাদী হেফাজতকেও মহিয়ান করেছে শেখ হাসিনা। এসবই ধর্মবাদী রাজনৈতিক তৎপরতাকে বাড়িয়ে তোলার ভিত্তি হিসেবে বিরাটভাবে কাজ করছে ও করবে।

ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে বিপ্লবী ও প্রগতিশীল শক্তিকে বিকশিত করার মাধ্যমেই ইসলামবাদী শক্তিগুলোর অগ্রযাত্রাকে প্রতিহত করা সম্ভব।

নতুবা হাসিনা-ফ্যাসিবাদ ও পাল্টা ইসলামবাদী ফ্যাসিবাদ– এই উভয়ের কবলে পড়ে দেশ ও জনগণের বিশাল ও দীর্ঘস্থায়ী ক্ষতি হবে।

৫। পুনর্বার প্রমাণ হয়েছে যে, ভোট বা শান্তিপূর্ণ কোনো পথ এই ফ্যাসিবাদের বিরোধিতার কোনো কার্যকর পন্থাই নয়। শুধু যে প্রধান বুর্জোয়া প্রতিদ্বন্দ্বীদেরকে সরকারি দল ভোটের দিন হামলা-মামলা দিয়ে সরিয়ে রেখেছে তাই নয়; তারা বহু আগে থেকেই বিরোধীদেরকে বর্বর ও নগ্ন দমন-অত্যাচার-হত্যা-গুম ইত্যাদির দ্বারা, এবং নিজেদের ক্ষেত্রে সরকারি প্রতিষ্ঠান, মিডিয়া, অর্থ ও শক্তির দ্বারা একতরফা প্রচার ও মাঠ দখলের মাধ্যমে তাদের 'ভূমিধ্বস বিজয়ে'র পূর্ণ ক্ষেত্র তৈরি করে রেখেছিল। নির্বাচনটি ছিল শুধুমাত্র একটি আনুষ্ঠানিকতা, যাকে কিনা উলঙ্গভাবে সমর্থন-সহযোগিতা যুগিয়েছে পুলিশ-র‍্যাব-মিলিটারি-ইসি-আদালত-আমলা ইত্যাদি ইত্যাদি। তাদের ফ্যাসিবাদ এতই উদ্ধত, নগ্ন, নির্লজ্জ ও নিরংকুশ যে তারা বাম পেটিবুর্জোয়া, এমনকি গণনাযোগ্য নয় এমন সব প্রার্থীদেরকেও মাঠে উঠতে দেয়নি, জনগণকেও তারা ভোট দিতে দেয়নি। যাকিছু করার তারা নিজেরাই করেছে। সরকার-বিরোধিতার সকল বৈধ পথও তারা বন্ধ করে দিয়েছে।

এই পরিস্থিতি দেখিয়ে দেয় যে, এই ফ্যাসিবাদকে সশস্ত্র আঘাত ছাড়া, এবং তাদের এমন প্রহসনের ভোট-রাজনীতিকে সম্পূর্ণ বর্জন ছাড়া কোনোভাবেই জনগণের রাজনৈতিক শক্তি সংগঠিত করা যাবে না, কাবু করা-তো পরের কথা।

৬। আন্তর্জাতিক রাজনীতি ও তার অধীনে দক্ষিণ এশীয় আঞ্চলিক রাজনীতিতে বৃহৎ শক্তিগুলোর ভূমিকা ও অবস্থান আমাদের দেশের এই রাজনৈতিক পরিস্থিতি বিকাশের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ও নির্ধারক ভূমিকা রেখেছে।

এটা প্রমাণিত হয়েছে যে, ভারতে যে সরকারই ক্ষমতায় থাকুক না কেন, বাংলাদেশে তাদের প্রথম পছন্দ হলো তাদের একনিষ্ঠ দালাল হাসিনার সরকার। আর হাসিনা সরকার সর্বতোভাবে ভারতের দালালীকেই তাদের রাজনীতির কেন্দ্রবিন্দু করেছে। একে ভিত্তি করেই তারা অন্যান্য বহিশক্তিগুলোর দালালী করতে চায়।

বিশ্ব রাজনীতিতে সাম্রাজ্যবাদীদের মধ্যকার দ্বন্দ্ব এখনো চূড়ান্ত মেরুকরণে পৌঁছেনি বলে চীন-রাশিয়া ও আমেরিকা– এই দুই পক্ষের সাথেই সম্পর্ক রেখে ভারত দক্ষিণ এশিয়ায় তার নিয়ন্ত্রণ ও আধপত্য চালিয়ে যেতে এখনো সক্ষম হচ্ছে।

এ অঞ্চলে চীনের সাথে ভারতের দ্বন্দ্ব অমীমাংসেয়। কিন্তু বাংলাদেশে চীন এখনো প্রধানত তার অর্থনৈতিক স্বার্থ দ্বারাই চালিত হচ্ছে। ফলে, হাসিনার দ্বারা ভারতের একনিষ্ঠ দালালি সত্ত্বেও চীন তাদের অর্থনৈতিক বিনিয়োগ ও বাণিজ্য রক্ষার ক্ষেত্রে হাসিনা সরকারের দেয়া ভাল সুযোগকে অব্যাহত রাখার জন্য তাকেই সমর্থন দিয়ে চলেছে।

তদুপরি এ অঞ্চলে, বিশ্বের অন্যান্য অংশের মতই, চীনের প্রধান মাথাব্যাথা হলো আমেরিকার সাথে তার দ্বন্দ্ব, বৈশ্বিক পরিপ্রেক্ষিত, কারণ চীন এখন নিজেকে বিশ্বশক্তি হিসেবে বিকশিত করছে। তাই, বাংলাদেশে, এবং এই অঞ্চলে চীন তার অর্থনৈতিক আধিপত্য বিস্তারে মনোযোগী, যাতে আমেরিকার প্রভাবের বদলে এ অঞ্চলে, বাংলাদেশেও, সে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে পারে। এই লক্ষে সে ভারতের সাথে প্রতিদ্বন্দ্বিতা সত্ত্বেও তাকে কিছু ছাড় দিতে রাজী। উপরন্তু খোদ ভারতের উপরও মার্কিনের বিপরীতে প্রভাব বৃদ্ধির একটা প্রচেষ্টাও তার রয়েছে।

এসবই, ভারতের কট্টর দালালি সত্ত্বেও, হাসিনা সরকারের পক্ষে চীনের সমর্থন নিয়ে এসেছে।

– কিন্তু এ অবস্থাটা এভাবেই অব্যাহত থাকবে তা নয়। আগামীতে দ্রুতই চীন আরো বেশি করে আগ্রাসী ভূমিকায় অবতীর্ণ হবে; ফলে ভারতের সাথে তার দ্বন্দ্বও তীব্র হতে বাধ্য। তবে সেক্ষেত্রেও ভারতকে কিছু ছাড় দিয়ে হলেও চীন আমেরিকার আধিপত্যকে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবে, যা কিনা আমেরিকাও বিপরীতভাবে

করছে। ফলে বাংলাদেশে আমেরিকা যদিও হাসিনা সরকারকে চাপে রাখতে চায়, এবং বিএনপি জোটকে সুযোগ দিতে চায়, কিন্তু তারা এখন ভারতের সাথে চরম বৈরিতায় গিয়ে তা করবে না। উপরন্তু, আমেরিকান রাষ্ট্র/শাসকশ্রেণি বর্তমান সময়ে ট্রাম্প প্রশাসনকে নিয়ে তার নিজ সাম্রাজ্যেই সংকটে রয়েছে। অন্তত নিজ দেশে আগামী নির্বাচন পর্যন্ত আমেরিকা বড় ধরনের কোনো ঝুঁকি বাংলাদেশের ক্ষেত্রে নেবে না বলেই মনে হয়।

এ অবস্থায় বিএনপি জোট নিরংকুশভাবে বৈদেশিক শক্তিগুলোর সক্রিয় সহযোগিতা থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। এই সামগ্রিক পরিস্থিতি হাসিনা-আওয়ামী লীগের ফ্যাসিবাদ অব্যাহত রাখতে পারার একটা বড় কারণ।

৭। পরিস্থিতির আরেকটি দিক হলো, জনগণের দিক থেকে শক্তিশালী ভারত-বিরোধী আন্দোলনের অভাব রয়েছে। বিপ্লবী ও প্রগতিশীল শক্তি দুর্বল। তথাকথিত বামপন্থীরা ভারতীয় সম্প্রসারণবাদের বিরোধিতার ক্ষেত্রে একেবারেই অনিচ্ছুক। '৭১-এর চেতনা, মৌলবাদবিরোধিতা ও অসাম্প্রদায়িকতার নামে বুদ্ধিজীবী-গোষ্ঠী ও তথাকথিত বামরা কার্যত ব্যাপকভাবে ভারতীয় সম্প্রসারণবাদের স্বার্থকে রক্ষা করে চলেছে। এদের বিরাট অংশ বিবিধ সুবিধা-প্রাপ্ত হয়ে ভারতের দালালে পরিণত হয়েছে।

এমনকি বিএনপি'র মতো শাসকশ্রেণির প্রতিক্রিয়াশীল শক্তির ভারত-বিরোধী যে চেহারা ছিল, ক্ষমতায় যাবার স্বার্থে সেটাও তারা বর্জন করেছে। তারা খোলামেলাই ভারতের সাথে আওয়ামী লীগের দেশ-বিরোধী চুক্তিগুলো অব্যাহত রাখার ঘোষণার মাধ্যমে ভারতের সুদৃষ্টি কাড়ার ব্যর্থ চেষ্টা করেছে। যা তাদের রাজনীতিকে বর্তমান অবস্থায় দুর্বল করে ফেলেছে। আর এই দুর্বলতাকে আওয়ামী লীগ চতুরতার সাথে ব্যবহার করছে 'জামাত ছাড়ো' কৌশলের দ্বারা।

এই সমগ্র পরিস্থিতি ভারত ও আওয়ামী লীগের দেশ-বিরোধী বহু অপতৎপরতা সত্ত্বেও শক্তিশালী বিরোধিতাকে পাশ কাটানোর সুযোগ করে দিয়েছে।

৮। তবে ফ্যাসিবাদ ও ভারতের দালালির মাধ্যমে ক্ষমতা কুক্ষিগত করতে সক্ষম হলেও হাসিনার আওয়ামী লীগ ও সরকার বহুবিধ সংকটে রয়েছে, যা আরো বৃদ্ধি পাবে।

প্রথমত, সমস্ত কিছুই নিজেদের পরিকল্পনামতো তারা ঘটাতে পারছে না ও পারবে না। ২০১৪ সালের পর পরিস্থিতি এমন জায়গায় গেছে যে, আওয়ামী লীগ নির্বাচনে হারতেও আর সক্ষম নয়। তারা বাঘের পিঠে উঠেছে যা থেকে তারা নামতে সক্ষম নয়। তারা একেবারে ঘাসমূল পর্যন্ত যে ফ্যাসিবাদী কাঠামো গড়ে

তুলেছে এবং প্রশাসনের সকল ক্ষেত্রে যেভাবে দলীয়করণ ও দুর্নীতি ছড়িয়েছে তাতে অনেককিছুই কেন্দ্রীয়ভাবে নিয়ন্ত্রণ করা তাদের পক্ষে সম্ভব নয়।

তাই, দেখা যাচ্ছে যে, নির্বাচনে এমনই একতরফা 'বিজয়' তারা পেয়েছে যার জন্য তারা নিজেরাও প্রস্তুত ছিল না। প্রধানমন্ত্রীর উদ্ধত ও মাথামোটা পুত্র পর্যন্ত বিরোধী দলকে ৮০ থেকে ১৩০টির মতো আসন দিতে প্রস্তুত ছিল। সেখানে তারা দিতে পেরেছে মাত্র ৮টি আসন। একারণে এখন খোদ প্রধানমন্ত্রী, রাজপুত্র জয় ও কাদেরের মতো আওয়ামী মহারথীরা নিজেরাই বিএনপি'র এতো কম আসন পাবার ব্যাখ্যা দিতে বাধ্য হচ্ছে, যা তাদের ভোট-ডাকাতিকে আড়াল করার অপচেষ্টা ছাড়া আর কিছু নয়। ফলে, এখন জোর করে এরশাদের জাতীয় পার্টিকে বিরোধী দল বানাতে হচ্ছে, অতি-নিম্ন সংখ্যায় আসন দেয়ার পরও বিএনপি, ২০-দল ও ফ্রন্টকে ভাঙ্গার চেষ্টা করা হচ্ছে, যারা সংসদ বর্জনে বাধ্য হয়েছে।

একক ক্ষমতার কারণে, এবং হালুয়ারুটি খাওয়ার বিরাট সুযোগ পাওয়ায় তাদের নিজেদের মধ্যে ক্ষমতার ভাগাভাগি নিয়ে দ্বন্দ্ব উপর থেকে নিচ পর্যন্ত বিস্তার লাভ করেছে। ইতিমধ্যেই পুরনো আর নতুন ক্ষমতার পুনর্বিন্যাসের প্রেক্ষিতে সংঘাত ও খুনোখুনি পর্যন্ত হচ্ছে। আওয়ামী লীগ নেতৃত্বের-উত্তরাধিকারের ক্ষেত্রেও বড় ধরনের সমস্যার মুখোমুখি। একেবারে কেন্দ্রে 'জয়পন্থী' ও 'রেহানাপন্থী' দ্বন্দ্ব আগামীতে গুরুতর রূপ নিতে পারে। মন্ত্রীসভার অপ্রত্যাশিত পুনর্গঠন কেন্দ্রে এই অস্থিরতা ও অনিশ্চয়তারই প্রকাশ, যা তাদের অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্বকে আগামীতে বড় আকারে বিকশিত করবে।

আমেরিকা ও ইউ-এর দেশগুলোর সাথে এমন একটি সরকারের সম্পর্ক কোনোভাবেই মসৃণ হবে না। তারাও সুযোগমতো ষড়যন্ত্র চালিয়ে যাবে। উপরন্তু, চীন ও ভারত এবং ও চীন ও মার্কিন– এরকম দুই নৌকায় পা দিয়ে এ সরকার ভবিষ্যতে কতটা এগোতে পারবে, বিশেষত চীনের সাথে ভারত ও মার্কিনের দ্বন্দ্বের তীব্রতার প্রেক্ষিতে– সেটা একটা বড় বিষয় হিসেবে সামনে আসতে পারে।

সর্বোপরি, এই ফ্যাসিস্ট নেতৃত্ব, পার্টি ও তাদের রাষ্ট্রযন্ত্র ক্ষমতাসীন আমলা, দলীয় বুর্জোয়া, লুটেরা, গডফাদার, দুর্নীতিবাজ ও নিচু স্তরে গণবিরোধী সন্ত্রাসী মাস্তান ব্যতীত এমনকি শাসকশ্রেণির বিরাট অংশ থেকেও বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে। গুটিকয় মাথাবিক্রেতা সুবিধাভোগী বুদ্ধিজীবী– সাংবাদিক, শিক্ষক, লেখক, শিল্পী তাদের স্তাবক হিসেবে রাজাকারের মতো ভূমিকা রাখছে। আর ব্যাপক সাধারণ জনগণ থেকে তারা একেবারেই বিচ্ছিন্ন। তাদের ক্ষমতার সূচনা হয়েছে সুবর্ণচর ও কলমা গ্রামের মতো মধ্যযুগীয় বর্বরতার দ্বারা, গার্মেন্টস শ্রমিকদের সাথে মজুরি-বৃদ্ধি নিয়ে প্রতারণা ও শ্রমিক-হত্যার দ্বারা। প্রথমদিনই তারা শুরু করেছে চালের

দাম বৃদ্ধি এবং নিজ ঘনিষ্ঠ মিত্র এরশাদকে গৃহবন্দী করে তাকে 'সাইজ' করার ষড়যন্ত্রের মধ্য দিয়ে।

এই নিপীড়ন ও লাগামহীন শোষণ-লুণ্ঠন, ষড়যন্ত্র ও প্রতারণা আরো বাড়বে ও তীব্র হবে। যা অবশ্যই ক্ষণে ক্ষণে জনগণের বিদ্রোহে রূপ নেবে। বুর্জোয়া বিরোধী বিভিন্ন পক্ষের দেশি-বিদেশি ষড়যন্ত্র শক্তিশালী হবে।

শেখ হাসিনা ও তার নতুন সরকার একটি দিনের জন্যও শান্তিতে থাকতে পারবে না।

৯। বিরোধী বুর্জোয়াদের ভবিষ্যত কী হবে তা এখনি নিশ্চিত করে বলা যায় না। তবে বিশ্ব-সাম্রাজ্যবাদের প্রয়োজন রয়েছে একটি সক্ষম বিরোধী শক্তির। আন্তসাম্রাজ্যবাদী দ্বন্দ্বের বিকাশ ও তীব্রতার ফলশ্রুতিতে এখানকার শাসকশ্রেণির মধ্যেও ভাঙ্গা-গড়া চলবে। সবমিলিয়ে একটি ঘোষিত ফ্যাসিবাদী ও একদলীয় রাজত্ব কায়েম করা হাসিনা-আওয়ামী লীগের জন্যও প্রায় অসম্ভব একটি কাজ হবে, যদিও তার সম্ভাবনাকে উড়িয়ে দেয়া যায় না। এরশাদ, খালেদা ও হাসিনা– এই ত্রয়ীর যুগ শেষ হবার দিকে, এবং সমগ্র শাসকশ্রেণির প্রয়োজন সৃষ্টি হয়েছে তাদের নতুন নেতা ও পার্টি দাঁড় করানোর, যা এমনতরো ফ্যাসিবাদের পরিস্থিতিতে মোটেই সহজ কাজ নয়। সুতরাং তারা সমগ্রভাবেই সংকটের মধ্যে রয়েছে।

১০। আগেই বলা হয়েছে, ফ্যাসিবাদকে সামরিকভাবে আঘাত করা ব্যতীত কোনো শক্তি এখানে সংগঠিত হতে পারবে না। ফ্যাসিবাদকে বাইরে যতটা শক্তিশালী দেখা যায়, তারা ভিতরে ভিতরে ততটাই দুর্বল। তাকে আঘাত করলে অসংখ্য নিপীড়িত মানুষ ও শক্তি জেগে উঠবেন, সংগঠিত হবেন, তারা আরো বড় আঘাত হানবেন এবং এভাবে আপাত চ্যালেঞ্জবিহীন তাদের আজকের ক্ষমতা জনগণের সক্রিয় প্রতিরোধের মুখোমুখি হবে।

বুর্জোয়া বিরোধীরা ও সংশোধনবাদীরা বলেছিল বিনাচ্যালেঞ্জে সরকারকে ছেড়ে দেয়া হবে না। তাই তারা নির্বাচনে গিয়েছিল। নির্বাচন প্রমাণ করেছে, নির্বাচনী মাঠের চ্যালেঞ্জের কোনো ধারই ধারে না এই ফ্যাসিবাদ। রাজপথও তাদেরই দখলে। তাই, তাদেরকে প্রকৃত চ্যালেঞ্জ জানানোর যে কার্যকর পন্থা– সশস্ত্র আঘাত, গেরিলা সংগ্রাম, গণযুদ্ধ– সে পথেই জনগণকে এগিয়ে আসতে হবে। এটাই বিকাশের পথ, বুর্জোয়ার বিপরীতে জনগণের পথ, মুক্তির পথ।

– কেন্দ্রীয় কমিটি, পূর্ব বাংলার সর্বহারা পার্টি ॥